বাংলা গান ঃ ১৭৫৭- ১৯০০

রমাকান্ত চক্রবর্তী

বাংলা গদ্যভাষা যখন নানা কারনে আড়ষ্ট ছিল, তখন বাংলা সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন ছিল কবিতা এবং গান। বিভিন্ন দেবদেবী মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক মঙ্গল কাব্য ছিল গেয় কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন-গানের প্রয়োজনে রচিত হয়। বঙ্গে রাগ-রাগিণীভিত্তিক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুরধারা বঙ্গে আসে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

Indian music, particularly in North India made certain great advances from the time of Akbar, when the Dhrupad Style as perfected by Tansen was the most prominent..... Some of the most beautiful melodies from Turan or Central Asia (the Turki World), Iran or Persia, and from some of the Arab countries like Yemen, were introduced into India and they were easily adopted and were merged with Indian molodies, and this has given a characteristic charm to North Indian or the Hindustani style of Indian singing.

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে 'সেনী'- ঘরানা এই কালে বিকশিত হয়। সমগ্র অষ্টাদশ শতক ধরে গীতচর্চা চলেছে কৃষ্ণনগরে, ঢাকা সহরে, শান্তিপুরে, চুঁচুড়াতে, চন্দননগরে, কলকাতায়।
বঙ্গে অবিমিশ্র শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বোধ হয় ছিল না। বিষ্ণুপুর-ঘরানার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গে সর্বদাই 'দেশী'-গানের সঙ্গে মার্গসঙ্গীত মিশ্রিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুশীলনে অগ্রগণ্য ছিলেন প্রধানত 'ভক্ত' গায়ক ও কবিগণ। বঙ্গে ঠিক এভাবে গীতচর্চা হয়নি। বঙ্গীয় গানে যেমন আছে ধর্ম, তেমনই আছে বিবিধ লোকায়ত উপাদান।

উপরিউক্ত কালে বঙ্গে অসংখ্য কবি গান লিখেছিলেন, গানের সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ও তাল উল্লেখ করেছিলেন । এই অবিসংবাদিত তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায় যে, বঙ্গের শিষ্টবর্গীয় সংস্কৃতিতে বহুকাল পর্যন্ত 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীতের সুরজ্ঞান ও তাললয়জ্ঞান একটি বিশিষ্ট মাত্রা ছিল। সংখ্যাতীত শিষ্টবর্গীয় গীতপদে যে সব 'মোটিফ্' আছে অদ্যাবধি সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণথেকে তা পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ পুরাতন বাংলা গানের ঐতিহাসিক মূল্য অনুভব করেননি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচলিত বাংলা গানের সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রচেষ্টার নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই। মার্গ সঙ্গীতের ব্যাখ্যাকরে রাধামোহন সেনদাস 'সঙ্গীততরঙ্গ ' রচনা করেছিলেন; তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে। স্বরচিত টপ্পা-গানের সংকলন 'গীতরত্ন' রামনিধি গুপ্ত(নিধু বাবু) প্রকাশ করেছিলেন ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ বসুমল্লিক স্বরচিত বিবিধ গানের সংকলন 'সঙ্গীত রস মাধুরী' প্রকাশ করেন ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলা 'রঙ্গিন গান' -এর একটি বড় সংকলন 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (তৃতীয় খন্ড)। গানগুলো সংকলন করেছিলেন বহুভাষাবিদ্, রাজস্থানের

বিখ্যাত সঙ্গীত-পন্ডিত, কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর। সংকলনটি কলকাতার বহু ধনীর অর্থানুকুল্যে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসকে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তখন কৃষ্ণানন্দ নববই বছরের যুবক; তিনি রাজপুত বন্দীর সাজপোষাক পরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এক অবিস্মরণীয় বীরগাথা।২

কালক্রমে বহু ধরনের পুরাতন বাংলা গান হারিয়ে যায়। হারানো গানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন ইংরেজ ভক্ত কিন্তু দেশপ্রাণ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর অনুসন্ধান ছিল কষ্টসাধ্য। তিনি লিখেছেন ঃ
দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জল বক্ষ ঃস্থলে প্লাবিত হয় ..... পায়ে ধরিয়েছি, হাতে ধরিয়েছি, কত বিনয় করিয়াছি, স্বয়ং গিয়াছি, লোক পাঠাইয়াছি, পত্র লিখিয়াছি... জলে ভাসিয়াছি ..... আহার নিদ্রার সুখে বর্জ্জিত হইয়াছি, প্রাণের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছি ....
এইরূপ দুঃসহ প্রচেষ্টাতে, দুনির্বার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাতে বিপন্ন দেশের প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানার জন্য, এবং বাঁচিয়ে রাখার জন্য, যে-দেশাভিমান প্রয়োজনীয় ছিল, তা ক্রমশ সুপস্ফিুট হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে কয়েকটি গুত্বপূর্ণ গীতসংকলন প্রকাশ করেন গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৭৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৫), নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৮), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬), অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৯৮), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়(১৮৯৯), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯), জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৯০৩), এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৯০৫)। বর্তমান শতকেও কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কালী মির্জা, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোপাল উড়ে, রূপচাঁদ পক্ষী, মধু কান, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবি ও গায়কদের রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।৪

এসব সংকলন-গ্রন্থের অবস্থা খুব খারাপ। অনেক গ্রন্থের পৃষ্ঠা স্পর্শমাত্র টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পাঠাগারের ধূলিমলিন, ছুঁচো, ইঁদুর এবং কীটপূর্ণ ঘরে, আর্দ্র আবহাওয়াতে এসব অমূল্য গ্রন্থ মৃতপ্রায়। এমন শোনা গিয়েছে যে, বটতলায় প্রকাশিত বেশ কিছু 'প্রেম-সঙ্গীত', সোনাগাছির প্রাচীন গনিকালয়ে এখনও সুরক্ষিত হয়।

আঠার শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে বহু রকমের গান রচিত হয়েছিল। এই সময়কে গানের যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। এটা ছিল এক অদ্ভুত ঘটনা। 'বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ড রূপে পোহালে শর্বরী'। প্রচলিত অর্থনীতি, ভূমি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। সাতাত্তরের মন্বন্তরে অসংখ্য মানুষ মারা গেল। চলতে থাকল ইংরেজদের এবং তাদের দেশী চাকরদের অবাধ লুণ্ঠন। কিন্তু রঙ্গভরা বঙ্গদেশে যেন গানের বান ডাকল। আবার ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু বাঙ্গালি ক্রমশ বাংলা গান ভুলে গিয়ে হিন্দি 'ফিল্মী' গান শুনতে এবং গাইতে লাগল। ভাল ভাল বাঙ্গালি গায়করা সুদূর মুম্বাই নগরে গমন করলেন।

উপরে উক্ত গানের যুগের উদ্বোধন করেন অসামান্য কবি ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর । সেই যুগধারাকে প্রায় অবিশ্বাস্য ভাবে পরিব্যাপ্ত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের পরে 'আর নাই'। যে সব গান এ সময়ে উদ্ভাসিত হয়, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল শাক্ত গীতি, টপ্পা গান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, 'পক্ষী'-গীতি, ঢপ গান; বিশিষ্ট ছিল কবিগান, পাঁচালী-গান, যাত্রা-গান; ক্রমশ বিকশিত হয়েছিল ব্রাহ্মগীতি, 'ভারতসঙ্গীত', সমাজ সংস্কার বিষয়ক গান, থিয়েটারের গান, প্রহসনের গান, এবং অশ্রাব্য 'পোর্নোগ্রাফিক্' গান;প্রচলিত হয়েছিল কর্তাভজা-সঙ্গীত, বাংলা সুফী-গান, এবং বিবিধ ভক্তি-গীতি। সর্বোপরি ছিল পদাবলী-কীর্তনের সবল ধারা, এবং গ্রামীণ পটভূমিতে বহু রকমের পল্লীগীতি।

প্রথমেই ভারতচ ন্দ্রের উল্লেখ করা হয়েছে এই কারনে যে, তিনি 'অন্নদামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে এমন কয়েকটি গান লিখেছিলেন, যেগুলো বৈষ্ণবীয় আবরণ সত্ত্বেও 'আধুনিক' মনে হয়, যেমন, 'ওহে বিনোদ রায়,

ধীরে ধীরে যাও হে', 'কি বলিলি মালিনি ফিরে ফিরে বল', 'বড় রসিয়া নাগর হে'।৫ 'বিদ্যাসুন্দর' সঙ্গীতগর্ভ হওয়ার জন্যই প্রতিভাশালী শিল্পী বৌবাজারের গোপাল উড়ে তাকে ধারানিবদ্ধ টপ্পা গানে রূপান্তরিত করেন। আবার গোপাল উড়ের টপ্পারও অত্যন্ত অশ্লীল রূপান্তর আছে। তা বোধহয় অনিবার্য ছিল।৬

উনিশ শতকের শুতে বাংলা গানের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন পাদ্রি ওয়ার্ড এবং ওয়াল্‌টার হ্যামিলটন্‌।' ধর্মের গান ও প্রেমের গান জনপ্রিয় ছিল। সংস্কৃত এবং দেশী কবিতায় বহু ক্ষেত্রে ধর্ম ও আদিরস সংমিশ্রিত হয়েছে। জয়দেবের 'গীতগো াবিন্দ', এবং বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এইরূপ সংমিশ্রণের বড় প্রমাণ। শিব পার্বতীর দাম্পত্যরতির বিশদ বিবরণ রয়েছে রামের চক্রবর্তী রচিত, তাঁর ভায়ায় 'ভদ্র ভব্য' কাব্য 'শিবায়ন'-এ। বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রেমের কথা, ধর্মের বা ভক্তির কথার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে আছে।

একটা সময় আসে, যখন প্রেমের গানে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে পার্থিবতাই বেশি প্রাধান্য পায়। আধ্যাত্মিক সঙ্গীত থেকে পা র্থিব প্রেম-সঙ্গীত আলাদা হয়ে যায়। বাংলা টপ্পা-গান তার বড় প্রমাণ। অনুমান করি, বাংলা প্রেমের গানের এইরূপ ক্রমবর্ধমান পার্থিব, বা মানসিক প্রকৃতির বা প্রবনতার সঙ্গে বঙ্গে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। ১৭৫৭ থেকে বঙ্গ সংস্কৃতির উপরে পুঁজিবাদ এবং জড়বাদ, অথবা 'আর্থিক বিবেচনা' গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থ পরমার্থকে ছাপিয়ে যেতে থাকে। বাঙ্গালি শিষ্টজন ঈশ্বরকে, এবং প্রচলিত ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অবশ্যই মেনে চলেছেন; কিন্তু ত াঁর ব্যবহারিক জীবনে 'পাইয়া', টাকা, সার্বভৌম হয়ে ওঠে। মানুষ, বিশেষত ধ্বতাঙ্গ মানুষ, ঈশ্বরের প্রায় সমান হয়ে দাঁড় াল। নতুন ধরনের বাঙ্গালি 'মানুষ'-এর সঙ্গে নগদ টাকার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের পত্নীদের প্রণয়িনীদের, এবং রক্ষিতা বেশ্যাদের মনের কথা নিয়ে রচিত হল টপ্পা গান, আখড়াই গান। তাই ইঙ্গিতে আমাদের জানিয়েছেন হুতোম প্যাঁচ া, চিরস্মরণীয় ভাষায়ঃ৮

পাঠক! .... মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল..... নবো মুনসী, ছিরে বেণেও পুঁটি তেলি রাজা হলো। ....হিন্দু ধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। ..... টাকা বংশ গৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন..... এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয়।

অথচ মানতেই হবে যে, 'নবো মুনসী' জাতীয় নব্য ধনী বাঙ্গালিরা নতুন নতুন বাংলা গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এইর ূপ পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের সামাজিক অবস্থানকে অর্থপূর্ণ করে। সর্বদা সাহেবদের হয়ে দালালি করলেও তাঁরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেননি, 'ইওরোপায়িত' হননি। প্রধানত জড়বাদী হলেও তারা সাংস্কৃতিক সাঙ্কর্যের বিরোধী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে তো বটেই, তার পরেও বহুকাল পর্যন্ত 'মুগল আভিজাত্য ' শিষ্ট সমাজে প্রচলিত ছিল। টপ্পা, ঠুংরি, গজল, খেয়াল সেই সূত্র ধরেই বঙ্গে আসে, বঙ্গে স্থায়ী হয়। পাশ্চাত্য সুরধারাকে বাংলা গানে টেনে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়নি। অনেক পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এই চেষ্টা করা হয় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিট' আবিষ্কার করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ - রচিত 'বাল্মিকী-প্রতিভা'র (বঙ্গাব্দ ১২৯২) কোন কোন গানে বিলাতি সুর দেওয়া হয়। ভাষাত ত্ত্ব বিদ্‌ জর্জ আব্রাহাম্‌ গ্রিয়ারসন্‌-কথিত, বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতি বিশিষ্ট 'Calcutta Civilization'-এ এইরূপ সাঙ্গীতিক সাঙ্কর্য অনিবার্য ছিল।

সময়ানুযায়ী না হলেও প্রথমে টপ্পাগান, এবং টপ্পা গানের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কয়েকটি গান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অ ালোচনা করি। টপ্পা ছিল পাঞ্জাবের উট-চালকদের গান।১০ শোরি মিঞা নামক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী (বঙ্গাব্দ ১১৪৯-১১৯৯) এই গানকে দুইটি 'তুক' বিশিষ্ট উন্নত টপ্পা গানে রূপান্তরিত করেন । টপ্পা গানের খ্যাতনামা অন্যতম শিল্পী ছিলেন গোলাম নবী (লক্ষ্ণৌ)। জিক্কুর টপ্পা এবং টুনোয়ার টপ্পা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' -তে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত। শোরি মিঞার অনেকগুলো গান কৃষ্ণানন্দ ব্যাস 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খন্ডে সঙ্কলন

করেছিলেন।

উত্তর ভারতের এই নতুন গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রামনিধি গুপ্ত(১৭৪১-১৮৩৯) ঃ অতঃপর নিধু বাবু), এবং কা লিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৫০-১৮২০ঃ অতঃপর কালী মির্জা)। নিধুবাবু বিহারের ছাপড়া সহরে 'কালেক্টরি'তে কাজ করার সময়ে টপ্পাসহ উচচাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে। কালি মির্জা লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দুস্তানী মার্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যে কে আগে বাংলা ভাষায় টপ্পা গান লিখেছিলেন, তা বলা মুস্কিল। নিধু বাবু কালী মির্জার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন ; সুতরাং তাঁর কথা আগে আলোচ্য।১২

একটি বিশেষ সূত্র থেকে বেশ কিছু টাকা পেয়ে নিধুবাবু ছাপড়া থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। হয়তো তার আগে থেকে তিনি টপ্পাগান লিখতেন। কলকাতায় এ গানের বহু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।কাজেই নিধুবাবুর অসুবিধা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন ঃ 'কি সধন কি অধন সর্বসাধারন ব্যক্তি নিধুবাবু কে বাবু শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, ব াবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি। তাঁর টপ্পা উচচস্তরের বাবুদের জন্য রচিত হয়েছিল। এই টপ্পা প্রধানত চার পঁ াচ চরনবিশিষ্ট ছোটগান, তাঁর ভাষা বিদগ্ধ, সুর ও তাল সংগীতশাস্ত্রসম্মত। ৫৫৪টি টপ্পার জন্য শতাধিক সুর উল্লিখিত হয়েছে'। তাল প্রধানত 'হরিতাল', 'একতালা', 'জলদ তেতালা'। প্রায় সব-গানের মোটিফ্' নরনারীর, বা নারীর প্রেমভ াবনা ।দুই একটি গানে অন্য ভাবনা আছে, যেমনঃ১৪
কামোদ-খাম্বাজ। জলদ তেতলা।
নানান্ দেশে নানান্ ভাসা(ষা)
বিনে স্বদেশীয় ভাষে পূরে কি আশা।।
কত নদী সরোবর, কি বা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি ত্রি(তৃ)ষা।।

বহু গানে নিধুবাবু 'মন'-এর রহস্য উল্লেখ করেছেন। এটিও অর্থপূর্ণ ছিল। তবে তাঁর সঙ্গে এ তথ্যও উল্লেখ্য যে, নিধুবাবুর টপ্পার , বা সমগোত্রীয় টপ্পার নন্দনতত্ত্ব প্রধানত ক্ল্যাসিক্যাল, কান্তিবিদ্যা থেকে ধার করা হয়েছে। বিচ্ছেদ, বিরহ, এবং বিরহজাত মানসিক ক্লেশ বহু টপ্পায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব গানে ধর্মের প্রসঙ্গ নেই। কোনও অশ্লীলতা এসব গানে দেখা য ায় না। সুশীল কুমার দে লিখেছেনঃ

There is a good deal of frankness and a passionate sense of the good things of life, it is true; but even judged by very strict standard, his songs are neither indecent, nor offensive, nor immoral.

কিন্তু দীর্ঘজীবী নিধুবাবুর জীবদ্দশায় তাঁর টপ্পাকে বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছিল; তাঁর অনেক গান হারিয়ে যাচ্ছিল। এ জন্যই ৯৭ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর টপ্পা গানের সঙ্কলন 'গীতরত্ন' প্রকাশ করেন(বঙ্গাব্দ ১২৪৪)।

টপ্পা গান দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল প্রধানত ভাবের ও সুরের আবেদনের জন্য। রাজেন্দ্র মিত্র এক কালে কালীপদ প াঠকের কাছে টপ্পা গানের তালিম পেয়েছিলেন; তিনি লিখেছেনঃ

[টপ্পার] এক একটি তানের ভিতর দিয়ে এক একটি ব্যাকুলতা যেন মর্ম স্পর্শ করে যায়.... [পশ্চিমী] টপ্পার দ্রুততানের ক াজটা বেশি, কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পায় এক একটি সুরের উপর আলাদা আলাদা আন্দোলন, তাতে করে গানের কণ রসটি অ ারও নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসে।

'সঙ্গীতরাগক ল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খন্ডে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস কালী মির্জার ২৬০টি গান সঙ্কলিত করেছেন।১৮ ওস্তাদ গায়ক হিসেবে হয়তো কালী মির্জা খ্যাতনামা ছিলেন; কিন্তু তাঁর টপ্পার ভাষা নিধুবাবুর টপ্পার ভাষার মত সুন্দর ও সরল নয়; ত া আড়ষ্ট মনে হয়। কালী মির্জার বহু গান শ্যামা সঙ্গীত। কয়েকটি গান শুধু স্বরলিপি । আরও যাঁরা টপ্পা লিখেছিলেন, ত াঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দাস সরকার, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, এবং শ্রীধর কথক(জন্মকাল, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ)। আশুতোষ দের [সাতুবাবু, ছাতুবাবু] এবং যদুনাথ ঘোষও টপ্পা রচনা করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীধর কথকের টপ্পাই কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল; অথচ কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজীতে এমন বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন, যা Anglo- Indian Poetry-র উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গ্রাহ্য হতে পা
র। শ্রীধর কথক 'কথক' ছিলেন বলেই তাঁর গানে বৈষ্ণবীয় প্রভাব আছে; কিন্তু তিনি মানুষের প্রেম নিয়েও সুন্দর গান লিখেছেন, যথাঃ১৯

ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে।
আমার সে ভালবাসা তোমা বই আর জানিনে।।
বিধু মুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই আমি দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ।।

অথবা
প্রেম গেলে হাসবে লোকে এই সব মানতে খেদ।
কথায় কথায় ছুতো নাতায় ক'র না আত্মবিচ্ছেদ।।
আগে ছিলে রসহীন
আমি তো শিখালাম প্রেম,
এখন হইল রে প্রাণ! চন্ডালে পড়ান বেদ।।

ত্রমশ বাংলা টপ্পা গানের ভাব ও ভাষা বিকৃত হয়ে পড়ে। টপ্পা গানের আদর যেমন কমে যেতে থাকে, তেমন অশ্লীল গানকে 'নিধুর টপ্পা' বলা হতে থাকে। অথচ, নিধুবাবু এবং অন্যান্য টপ্পা-রচয়িতাগণ কখনও অশ্লীল গান লেখেন নি; গানের ভাষায় এবং সুরে তাঁরা অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেন নি।

টপ্পা গানের সঙ্গে আখড়াই গানের সম্পর্ক ছিল।২০এ গানের 'সংশোধিত ' আকারেরস্রষ্টা ছিলেন নিধুবাবু এবং তাঁর অ াত্মীয় কুলুইচন্দ্র সেন। কুলুইচন্দ্র শোভাবাজারের রাজবাড়ির সভা গায়ক ছিলেন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'সংশোধিত' আখড় াই উদ্ভাবিত হয়। সপ্তদশ শতকে শান্তিপুরে এক ধরনের আখড়াই গান প্রচলিত ছিল; তার বৈশিষ্ট্য ছিল খেউড়ের নতুন নতুন ঠাট। দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির সুন্দরকে বিদ্যা বলেছিলেন; 'নদে শান্তি পুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নুতন নূতন ঠ াটে খেঁড়ু শুনাইব।'২১ নিধুবাবু এবং কুলুইচন্দ্র সেন 'খেড়ু' সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন না, কিন্তু 'সাজের বাজনা' নিয়ে এলেন। বস্তুত 'সংশোধিত' আখড়াই গানে প্রধানত টপ্পার গায়নরীতি, এবং 'সাজের বাজনা' প্রাধান্য পেল।

নিধুবাবুর উদ্যোগে শোভাবাজারে, এবং পাথুরিয়াঘাটার দুইটি অপেশাদার আখড়াই গায়করা দল গঠন করেন। আখড় াই গানের প্রতিযোগিতা হত দুইটি কিংবা তিনটি দলের মধ্যে। কোনও উত্তর প্রত্যুত্তর করা হত না। 'প্রত্যেক দলের একটি ভবানী বিষয়, একটি খেউড়,একটি প্রভাতী এবং মাঝে মাঝে অপূর্বর্ব সাজ বাদ্যেই রাত্রি কাটিয়া প্রহর বেলা হইয়া পড়িত।' সাজের বাজনায় প্রধানত তানপুরা, বেহালা, সেতার, বীণা, বেণু, জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল এবং ঢে াল ব্যবহার করা হত। আখড়াই- বাজনার তাল ছিল পিড়েবন্দি, দোলন, দৌড় ও সব দৌড়। তিনটি পর্যায় ছিল মহড়া, চিতেন ও পারঙ্গ। এই ধরনের Symphony-মূলক বাজনা উত্তর

ভারতে প্রচলিত ছিল না। গীত ভাষা যাই হোক না কেন, আখড়াই গান ছিল উচচাঙ্গ সঙ্গীত; আখড়াই গান 'রাগরাগিণীর খেলা, ছেলেখেলা নহে, অতিশয় কঠিন,' লিখেছেন ঈশ্বরগুপ্ত।

'সংশোধিত' খেউড় রাগরাগিণী অনুসারে গাওয়া হত; তা ছিল সাঙ্গীতিক চির বিপর্যয় মাত্র! নিধুবাবু কখনও খেউড় টপ্পা লেখেননি; কিন্তু আখড়াই গানের প্রচলিত বিধি অনুসারে তিনি খেউড় লিখেছিলেন, যেমন,২২

আখড়াই । দ্বিতীয় পাঠ। খেউড়। বেহাগ।
সাধের পিরিতি সুখে দুঃখ পাছে হয় (দেওরা ওরে)
তুমি হে চঞ্চল অতি সদা ওই ভয়।।
গোপনে যতেক সুখ
প্রকাশে তত অসুখ
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয়।
'দেওরা', বা দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর গোপন পিরিতির এইরূপ অশ্রাব্য খেউড় লিখেছিলেন বলেই নিধুবাবু শেষ পর্যন্ত স্রেফ 'নিধু ' হয়ে যান; তাঁর টপ্পাকে নেতিবাচক অর্থে বলা হয় 'নিধুর টপ্পা'। দাশরথি রায় লিখেছিলেনঃ২৩

এখনো গেল না বেটীর লুকিয়ে জল খাওয়া।
জুতোর চোটে ঘুটাব তোর নিধুর টপ্পা গাওয়া।।

কিন্তু উনিশ শতকের শুতে খেউড়ের সমঝদার শ্রোতাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে 'প্রবোত্তি ছেড়ের খেস্‌সা গান' শুনে সকলের 'খল খল শব্দে হাস্য নির্গত ' হওয়ার উল্লেখ করেছেন।

আখড়াই গান 'রঙ্গিন গান' হলেও তার 'সাজের বাজনা' ছিল পূর্ণভাবে ক্লাসিক্যাল। তা বোঝার এবং উপভোগ করার ক্ষমতা 'বাজে লোক'-দের ছিল না। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে ৬ই মাঘ গুচরণ মল্লিকের বাড়িতে শেষবারের মতো আখড়াই গান হয় । আখড়াই গান অচল হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য বাগবাজারনিবাসী বিখ্যাত গায়ক মোহনচাঁদ বসু কর্তৃক হাফ্ আখড়াই গানের উদ্ভাবন এবং প্রচলন। প্রথম হাফ-আখড়াই গান গাওয়া হয় ১২৩৮ বঙ্গাব্দে ৯ই মাঘ মেছুয়াবাজারের রামমোহন মল্লিকের বাড়িতে । নিধুবাবু হাফ আখড়াই গান পছন্দ করেন নি; প্রিয় শিষ্যের খাতিরে মেনে নিয়েছিলেন।২৫

গুদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'হাফ আখড়াইও এক প্রকার কবি, কিন্তু বসা২৬ অর্থাৎ কবি গান গাওয়া হত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; হাফ আখড়াই গাওয়া হত বসে বসে। হাফ আখড়াই গানের বিষয় এবং ভাষা প্রায়শ অভব্য হত, যেমনঃ

ওরে প্রাণরে ননদী ঢলালে, ওরে প্রাণ
কি ঢলান ঢলালে, কি ঢলান ঢলালে
কি ঢলান, ওরে প্রাণ ওরে প্রাণ কি ঢলান,
ওরে প্রাণ প্রাণ প্রাণ, কি ঢলান, ওরে প্রাণ
কি ঢলান, ওরে আমার প্রাণ,প্রাণ কি ঢলান,
ওরে প্রাণ কি ঢলান, ওরে প্রাণ, আবার
পতি হোলো কে হে তার।
এ রকম গান শোনা এখন দুর্ভাগ্যজনক মনে হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে স্পৃহনীয় ছিল। 'কলিকাতার

ইতিবৃত্ত' রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাল্যকালে মোহনচাঁদ বসুকে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেনঃ২৮

আমরা বাল্যকালে () দেওয়ান নিধুরাম বসুর প্রপৌত্র() মোহনচাঁদ বসু মহাশয়কে দেখিয়াছি, তখন তাঁহার বয়স ৬০/৭০ বৎসরের কম হইবে না.... তাঁহার দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দৃঢ় গঠন, ঘোরাল মুখ, মস্তকে বাবরী কাটা চুল ছিল..... পিনেসে তাঁহার নাক বসিয়াগিয়াছিল, সঙ্গীত করিবার ক্ষমতা নাই..... তিনি প্রথমে দলের ধর্ত্তাকে গানটি একবার গাহিতে বলিতেন, সমস্তটি শুনিয়া যেখানে যে খোঁচ খাঁচ থাকে, নিজে নাকিসুরেই সেগুলি এমন বুঝাইয়া দিতেন যে লোকে শুনিয়া যেন আপ্যায়িত হইত।..... আখড়াই ওয়ালা গায়কেরা মোহনচাঁদ সুরে সংকীর্ত্তন করিতেন।

শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক পারিষদ, শিবচন্দ্র ঠাকুর, গঙ্গার তীরে একটি আটচালা ঘরে কয়েকজন গাঁজাখোর যুবককে নিয়ে 'পক্ষীর দল' গঠন করেছিলেন।২৯ পরে এই দলের পষ্ঠপোষক হয়েছিলেন নিমতলার নারায়ন মিশ্র। 'পক্ষী'রা নিধুবাবুর মতো ওস্তাদকেও সেই আটচালা ঘরে নিয়ে এসেছিল। তিনি ছিলেন 'কর্ত্তা'। বাগবাজারে, বটতলায়, এবং বৌ বাজারে 'পক্ষীর দল' ছিল। গঙ্গার তীরে আটচালা ঘরে 'পক্ষী-রা যেমন গাঁজা খেয়ে 'পাকির বুলি ঝাড়ত', তেমন গান বাজনাও করত। প্রসঙ্গত রূপচাঁদ পক্ষী (জন্মকাল বঙ্গাব্দ ১২২১) উল্লেখযোগ্য । ১২৯৩ বঙ্গাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল উড়িষ্যাতে। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন তিনি। তাঁর ২১১ টি গানের সংকলন 'সঙ্গীতরসকল্লোল' প্রকাশিত হয়।৩০ ইংরেজী ও বাংলা শব্দে মেশান তাঁর কয়েকটি গান জনপ্রিয় হয়। তিনি নানা ধরনের বৈঠকী গানের বেশ ভাল গায়ক ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঙ্গীতকোষ'-এ কালীপদ নামক কবির পঞ্চাশটি 'পক্ষীগীত' সঙ্কলিত হয়েছে।"৩১ এই গানগুলো পড়ে মনে হয় যে, 'পক্ষীর গীত'-এর কাব্যাদর্শ ধার করা হয়েছিল সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি কবিতা থেকে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র বঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করা হত । কিন্তু এই বিষয়টি প্রধানত প্রামানিক তথ্যের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। পূর্বে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরের সেনী-ঘরানা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপর-ঘরানার শিল্পী/গু-পরম্পরা এইরূপ, যথাঃ৩২
বাহাদুর খান। গদাধর চত্রবর্তী কৃষ্ণমোহন গোস্বামী। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপ্পের বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর-ঘরানার সঙ্গে টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি গানের সংযোগ ছিল কি না, জানিনা। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনি পড়ে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কৃষ্ণনগরেও উচচাঙ্গ সঙ্গীত গাওয়া হত।৩৩ একটি বিবরণ অনুসারে সুবাহদার ইসলাম খান্-এর আমলে (১৬০৮-১৩) ঢাকা সহরে ১২০০ 'কিঞ্চিনী' ছিলেন; নাচগান করা তাঁদের পেশা ছিল। ফার্সি গজল-গায়িকা 'রাম্ভী' ঢাকায় 'খুব সস্তায় লভ্য' ছিল। উত্তর ভারতের প্রচলিত যাত্রা, অপেরা ঢাকা সহরে জনপ্রিয় ছিল।৩৪

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় এবং তার আশপাশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যাঁদের সূনাম ছিল, বিভিন্ন বিবরণে প্রাপ্ত তাদের নাম-ধাম এইরূপ, যথাঃ৩৫
আশুতোষ দেব (সাতুবাবু, অথবা ছাতু বাবুঃ সেতার শিল্পী, কলিকাতা) কালী মির্জা (লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, বর্ধমান) গঙ্গানারায়ন চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ দত্ত (বড়িষা) ধীরাজ (পক্ষীগীতি-গায়ক, কলিকাত) নিধুবাবু (কলিকাত) নবীনচন্দ্র গোস্বামী (সেতার-শিল্পী) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সেতার -শিল্পী) রামচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া) রাধিকাপ্রসাদ দত্ত (কলিকাতা) রামকানাই মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) রামদাস গোস্বামী (শ্রীরামপুর) রামাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান ও কলিকাতা) রাম বসু (হাওড়া, কলিকাতা) রূপচাঁদ পক্ষী (কলিকাতা) শ্রীধর কথক (হুগুলী, কলিকাতা) শ্রীনাথবাবু (সেতার- শিল্পী, হুগুলী)

শিবচন্দ্র পাল (সেতার শিল্পী) হ ঠাকুর (কলিকাতা)

বিখ্যাত মৃদঙবাদক ছিলেন রাম চত্রবর্তী, কেশবচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পঞ্চানন মিত্র। উনিশ শতকের শুতে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঢোলক-শিল্পী ছিলেন বৈষ্ণব দাস, রসিকচাঁদ গোস্বামী, ন্যাটা বলাই, নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং পচঁ াদ। আখড়াই - শিল্পীগোবিন্দ মালা এত ভাল গাইতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান গায়করূপে তিনি সম্ভবত রাজা রামমে াহন রায়ের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সেতার বাজানো অনেক বাঙ্গালি বাবুর 'সকের' বিষয় ছিল। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'এক বৎসর দোলের সময়...এক ডজন শ্যাম আবীর মেখে রাঙা টকটকে হয়ে রাস্তায় শুয়ে বসে গড়িয়ে কাদা মেখে আস্ছিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক এক সেতার।'৩৬ গৃহস্থ 'বাবু'দের সেতার বাজানোর উল্লেখ করেছেন টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোম প্যঁ াচা। ৩৬ক

পুরাতন বাংলা গানের অতি বিশিষ্ট ধারা ছিল পদাবলী-কীর্তন।৩৭ তার প্রসিদ্ধ শৈলী ছিল গড়ানহাটি, মনোহরশাহি, রেনেটি, মন্দারিনি এবং ঝাড়খণ্ডি। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক 'ঠাকুর মহাশয়' নরোত্তম মথুরা-বৃন্দাবলে উচচাঙ্গ শিখেছিলেন ; ১৬১০-১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেতুরি-(রাজশাহী)-উৎসবে তিনি 'গড়াহাটী'বা 'গড়ানহাটি'-কীর্তনের প্রচনলন করেন। এই কীর্তন ছিল ১০৮টি তাল বিশিষ্ট ধবপদী কীর্তন। এমন মনে হয় যে, এর সঙ্গে বিষুপুরের ধ্রুবপদ- শৈলীর, কিংবা 'সেনী ঘরানা'-র সংযোগ ছিৎ। বিষুঞপুরের রাজারও ছিল দীক্ষিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব। নরোত্তম দত্তের সময়ে এই কীর্তনের একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন মৃদঙ্গবাদক দেবীদাস।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫৪ তাল বিশিষ্ট 'খেয়ালাঙ্গ' মনোহরশাহি কীর্তন উদ্ভ াবিত হয়েছিল। গড়ানহাটি কীর্তন এখন আর শোনা যায় না; এখন সমস্ত কীর্তনই মনোহরশাহি কীর্তন। ঠুংরি-আঙ্গিকের রেনেটি কীর্তন, মঙ্গলকাব্য গীত প্রভাবিত মন্দারিনি-শৈলী, এবং ঝুমুর-প্রভাবিত ঝাড়খন্ডি কীর্তনও এখন লুপ্ত। মনোহরশাহি কীর্তন শেষ পর্যন্ত 'বৈঠকী' হয়ে পড়ে। এতে 'মধুর ভাব' অসামান্য গুত্ব পেয়েছিল। এই শৈলীতে গায়কদের প্রতিযোগিতাও প্রাধান্য পেতে থাকে। তাতে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণও সুস্পষ্ট ছিল। ঝুমুর গীতও স্থান পেয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রচলিত বহু জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করেছেন জয়নারায়ন ঘোষাল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বৈষ্ণবীয় গান, যথা ঃ৩৮

সঙ্কীর্ত্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব্ব সুন্দর।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।।
অনেক পাঁচালী ভাঁতি রামায়ণ সুর।
ভবানীভবের গান মালসী মায়ুর ।।
বাইশ আখড়া ছোপ প্রেমে চুরচুর।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।।
কালীয়দমন রাস চন্ডীযাত্রা ধীর।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছোপের লহর।
গড়াহাটী রাণীহাটী বিরহ মাথুর।
কবি পশতো তাল ফেরা শুনিতে মধুর।।
কথকতা তরজাতে সারিতে প্রচুর।
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর।।

গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর।।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপূর।
বাঙ্গালার নবগান নুতন ঝুমুর।।

সুরচিত এই তালিকা পড়ে এই মনে হয় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও কলকাতা সহর প্রচলিত সাঙ্গীতিক কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেনি। টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই কতগুলো বিশেষ নাগরিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর জনসমাজে পূর্বকাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা জনপ্রিয় ছিল। কলকাতা সহরে অ াশপাশের গ্রামাঞ্চল-সমূহ থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন, এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বহু কাল ধরে প্রচলিত 'বাইশ আখড় া ছোপ', সাপড়িয়া বাদিয়ার ছোপের লহর', কথকতা , তরজা, গোবিন্দ মঙ্গল, জারি, চৈতন্যযাত্রা, কালীয়দমন যাত্রা এবং 'নূতন ঝুমুর'। এখনও উত্তর কলকাতার বস্তিতে মনসামঙ্গল গাওয়া হয়, শীতলার গান গাওয়া হয়, রামায়ণ গান গ াওয়া হয়। আমার বাড়ির পাশের বস্তিতেই এসব গান গাওয়া হয়।

বৈষ্ণব পদাবলিতে সাধারণত পদকর্তার মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় না । এ বিষয়ে অবশ্যই 'ঠাকুর মহাশয়' নরোত্তম দত্ত রচিত 'প্রার্থনা' এবং 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু সমস্ত শাক্ত গীতিতে মনের কথা থাকে।৩৯ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই শাক্ত গানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে প্রধান দুই শাক্ত গীতকার ছিলেন রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। বৈষ্ণব পদাবলির অন্তর্নিহিত কোমলতা শাক্ত পদাবলিতে সঞ্চারিত হয়। শাক্ত গানে ধর্মীয় সংহতির বাণী থাকে। তাতে গায়নরীতির বৈচিত্র্য
দেখা যায়। তার যেমন আছে জনপ্রিয় 'রামপ্রসাদী' সুর, তেমন আছে টপ্পার সুর। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ এটা লক্ষ্য করেন নি যে, শাক্ত পদাবলিতে প্রচলিত অর্থনীতির সমালোচনা আছে, সমালোচিত হয়েছে ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড এবং প্রশংসিত হয়েছে মানব জীবন।

বহু মহারাজা, রাজা ও দেওয়ান শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন।৪০ তাঁদের চি অনুসারেই যে শাক্ত গান কালোয়াতি রীতিতে, অথবা টপ্পার সুরে ও তালে গাওয়া হত, এমন ভাবনা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্র, কুমার নরচন্দ্র , মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মহারাজা রামকৃষ্ণ, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজ া শ্রীচন্দ্র এবং বর্ধমানের রাজা মহতাবচাঁদ শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন। টপ্পা-রচয়িতাদের মধ্যে শাক্ত গান লিখেছিলেন নিধুবাবু, কালী মির্জা, আশুতোষ দেব, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

শাক্ত গীতির একটি বিশেষ প্রকরণ ছিল আগমনী ও বিজয়া গান। বাৎসল্য এবং কণ রসাত্মক এই দুই রকমের গানে কন্যা পার্বতীর প্রতি জননী মেনকার অসাধারণ স্নেহের ব্যঞ্জনা হৃদয় স্পর্শ করে। বৈষ্ণব পদাবলিতেও বাৎসল্য রসের বহু পদ অ াছে; কিন্তু তা বেশ কিছুটা নিয়ম মাফিক। আগমনী ও বিজয়ার গান স্বতস্ফূর্ত। চন্ডী, শিব এবং গঙ্গা বিষয়ক গানও প্রচলিত ছিল। হুতোম প্যাঁচা লিখেছেন ঃ৪১
জগা স্যাকরা চন্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল। সে মরে যাওয়াতেই আর চন্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতি দুর্লভ হয়েছে।

ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাঁরা 'নব্যধনী' হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মের এবং পদাবলি-কীর্তনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন। এমন কি উত্তর ভারতীয় ' হোরী গান' এক সময়ে শোনা যেত। গড়ানহাটার কমলাকান্ত দাস সরকারের পুত্র শিবচন্দ্র দাস সরকার হিন্দী ভাষায় অনেক 'হোরী গান' লিখেছেন। তিনি নিজেই হয়তো ক্লাসিক্যাল, 'হে ারী গান' -এর এবং 'বিষ্ণুপদী' গানের একজন বড় শিল্পী ছিলেন।৪২

মীয়া কি ধনাশ্রী ঃ চৌতাল।
ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সবর্বাত্মারে
অখন্ডসচ্চিদানন্দ বাক্য মনঃ অগোচরে ।
পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু
দেখ রবি প্রতিবিম্ব
তেমনি প্রত্যক্ষ আত্মা সবর্বভূত চরাচরে।।

উচ্চশিক্ষিত শ্রোতাই এই গানের মর্ম বুঝতে পারতেন। রামমোহন যে ঘরানা সৃষ্টি করলেন, তা গেয় পদের ও সুরতালের 'ক্লাসিসিজম্'-এর জন্যই অনন্য ছিল। পরে ব্রাহ্ম গানে ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয়। এ গানের একটি বিয়য়বস্তু হয়েছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

মুনসী বিলায়েৎ হোসেন কতগুলো সুফী গান বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচনা করেন।৪৪ মুসলমান হলেও তিনি 'কালীপ্রসন্ন' নামে পরিচিত ছিলেন। এই গানও টপ্পার সুরে তালে গাওয়া হত।

ব্রাহ্ম গানে টপ্পার সুর অনেকের পছন্দ হয়নি। খ্যাতনামা সঙ্গীতত্ত্ববিদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন ঃ ৪৫
ইদানীং ব্রহ্মগীত প্রায়ই টপ্পার সুরে রচিত হইতে দেখা যায়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। ইহা সঙ্গীততত্ত্বে অজ্ঞতা ও অনুন্নত চির ফল।

এই মন্তব্যে টপ্পার বিদুষণ সুস্পষ্ট।

কবিগান পুরাতন বাংলা গানের এক বিশিষ্ট মাত্রা। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই গানে ঝুমুর গানের, পদাবলি - কীর্তনের এবং কথকতার প্রভাব দেখা যায়। পূর্বে এই তথ্য আলোচিত হয়েছে যে বৈষ্ণবীয় 'কীর্তন' 'বৈঠকী' গান হয়ে যায় । এ গানের বহুস্তর ধর্মতত্ত্ব, ব্রজবুলি ভাষা, তৎসম শব্দের ও বিচিত্র ছন্দের দোলা, এবং দুর্লংঘ্য নিয়মে আবদ্ধ গাযনরীতি ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণ একে অপরকে ভালোবাসেন, এটাই ছিল পদাবলির প্রধান কথা; এই কথা নিয়ে জটিলতা সাধারণ শ্রোতারা বুঝতে চাননি। এই বিশেষ তথ্যকে কবিয়ালগণ নতুন ভাবে কবিতায় ও গানে সাজিয়ে দিলেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রাচীণ কবিয়ালদের গান সংগ্রহ করার জন্য ঈশ্বর গুপ্তকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই কবিয়ালরা ছিলেন গোঁজলা গুঁই, রাসু-নৃসিংহ, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, ভবানী বেনে, রাম বসু, হ ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, লালু-নন্দলাল, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, রামসুন্দর রায় এবং লক্ষ্মীকান্ত ঝিাস। গোঁজলা গুঁই রচিত একটি গান পড়ে মুগ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন ঃ৪৬

হায়রে! গুঁই , তুই, কি মানুষ ছিলিরে! মহাশূন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার তাঁহার নাম ' গোঁজলা' আঁজলার দ্বারা কি এই গোঁজলার নিরূপণ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ রহিলাম।

একটি পূর্ণ কবিগান সুদীর্ঘ; তার পর্যায়গুলো হল যথাক্রমে 'চিতান(১) 'পরচিতান', ফুকা', 'মেলতা', 'খাদ', 'ফুকা' (২)', অন্তরা', 'চিতান (২)' 'মেলতা (২)''পরচিতান (২)' 'ফুকা (৩)', 'মেলতা (৩)'। 'ফুকা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ফুঁক দেওয়া', ফুক দেওয়া দুধ', অর্থাৎ 'গোর যোনিতে ফুঁক দিয়া নিঃসারিত দুগ্ধ'। ' মেলতা', অর্থাৎ 'কবি গানে বা কীর্ত্তন গানে মহড়ার সহিত সুরে মিলিত গানের অংশ বিশেষ'। 'খাদ', অর্থাৎ 'মোটা সুর বিশেষ'। ৪৭ এই সব পর্যায়ে যে ন

াটকীয়তা ছিল, তাই ছিল কবিগানের প্রাণবস্তু।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন ঃ
বিশিষ্ঠ জনেরা ভদ্র গানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। (সখী সংবাদ ও বিরহ গানের) ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোট লোকেরা চিৎকার পূর্বক কহিল ঃ "হ্যাদ দেখ্ লেতাই (অর্থাৎ নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী) ফ্যার্ যদি কাল্ কুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়, (খেউড়) গা।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এবং হ ঠাকুর অশ্রাব্য খেউড় ও লহর গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে খেউড় কিছুটা 'পরিশোধিত' হলেও তার বিষয় ছিল অজাচার এবং 'Deviant Sex.' তার একটি নমুনা ঃ ৪৯

দীর্ঘকেশ নারীর বেশ তায় বিশেষ বক্ষদেশ
উচ্চ কি কারণ?
দেখি গন্ডদুটি পান্ডুর বরণ
ওরে প্রাণ, প্রাণ রে,
আবার ঘাঘরা ঘেরা উঁচু পেট!
এ কি অসম্ভব গর্ভের লক্ষণ দেখছি সব,
প্রাণ, তোমার কেটা বাঁধিয়ে দিলে পুরষের পেট!

ফাঁপা নয়, বেশ নিরেট!
সৃষ্টি ছাড়া কোন বেয়াড়া
পোড়ার মুখো সে,
ওরে প্রাণ, প্রাণ, ওরে প্রাণ,
এ কাজ কল্লে যে।।

বিভিন্ন সংকলনে বহু কবিগান খুঁটিয়ে পড়ে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাদের মধ্যে দশ বারোটি গান ভাল। তবে কবি গানে কথ্য ভাষার ব্যবহার গুত্বপূর্ণ ছিল।

পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ২৯৩ জন কবিয়াল যে গান রচনা করেন, তা দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা' শীর্ষক গ্রন্থে (কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়, ১৯৯৭) সঙ্কলিত হয়েছে। ৫০ এখানে সঙ্কলিত 'লহর' গ ানের মধ্যে কয়েকটি গান অশ্লীল ইঙ্গিতময়।৫১ পূর্ববঙ্গে যাঁরা খেউড় গাইতেন, তাঁদের সম্মান করা হত নাঃ ৫২
ছাড়া ভিটার বটের তলা
নয় তো কোনশ্মশান খোলা
বসাতে এই কবির মেলা ধনীরা সকল।
বিছানা দেয় না কবিরে
ধুলাকাদা মাটির পরে
বসে পড়তো পাছা গেড়ে খেউড় কবির দল।।

পূর্ববঙ্গীয় কবিয়ালদের এইরূপ দুরবস্থা দূর করেন ঢাকা জেলার নরসিংদির বিখ্যাত কবিয়াল হরি আচার্য (জন্ম ১৭৮৩ শকাব্দ, মৃত্যু বঙ্গাব্দ ১৩৪৮) যাত্রাগান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পাদ্রি ওয়ার্ড (১৮১১) কয়েকটি কৃষ্ণযাত্রায় উল্লেখ

করেছেন, যথা (তাঁর বানান অনুসারে)ঃ ৫৩

Manu-bhunga [মানভঙ্গ] Kulunku- ড্ডুক্তন্দক্তত্তত্ত্বকলঙ্ক ভঞ্জন] Pootanu-budhu [পুতনাবধ] Daru-khundu (Certain tricks of Krishnu with ব্ধড়ন্দ্ব প্পনপুপ্পন্নস্তুব্দ'ত্মদানখন্ড] Nauku-khundu [নৌকাখন্ড] Kaleeyu-dumunu[কালীয় দমন] Ukrooru-Sumbadu[অত্রুর সংবাদ] Dhoolee-Sungbadu[ঢুলী সংবাদ] Junmu-Yatra[জন্মযাত্রা] Kungshu-budhu[কংসবধ] Gosthu-yatru[গোষ্ঠযাত্রা] Radhika- raju[রাধিকা যাত্রা] [অথবা, রাইরাজা]

'মানভঙ্গযাত্রা'র সুতীক্ষ্ম কথোপকথন ওয়ার্ড-এর খুব ভাল লেগেছিল। তিনি যাত্রানুষ্ঠানের এইরূপ বিবরণ দিয়েছেনঃ ৫৪

Very frequently the yatra is prolonged till morning. Flambeans and other artificial lights are used. The spectators are affected with joy and grief.... The scenes are often very indecent....

জনপ্রিয় যাত্রা সম্বন্ধে সাহেবদের অত্যন্ত নেতিবাচক মূল্যায়ন উনিশ শতকের মধ্যভাগেও দেখা যায়; এক সাহেব লিখেছেন ঃ ৫৫ 'It would require the pencil of a master-painter to pourtary the killing beauty of the fairies of the Bengali stage. Their sooty complexion, their coal-black cheeks, their hagard eyes, their long-extended arms, their gaping mouths and their puerile attire excite disgust.'

ওয়ার্ড -এর মতে 'চণ্ডীযাত্রা' কৃষ্ণযাত্রার মতো জনপ্রিয় ছিল না। চারটি কৃষ্ণযাত্রাকে একসঙ্গে 'কালীয়দমন যাত্রা' বলা হত ; এগুলো ছিল 'যুগল মিলন', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মান' এবং 'মাথুর'। এছাড়াও ছিল 'চৈতন্য যাত্রা'।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পুরাতন কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন পরমানন্দ অধিকারী ও শিশুরাম অধিকারি। ত ারপর যাত্রাকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন শ্রীদাম ও সুবল (দুই ভাই), প্রেমচন্দ্র, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১- ১৯১১)। শেযোক্ত তিনজন যাত্রাকার গীতরচয়িতা এবং গায়করূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভৈরবী রাগিণীতে গেয় গোবিন্দ অধিকারীর গান, 'দে গো, বৃন্দে আমায়, যোগী সাজায়ে' এক কালে জনপ্রিয় ছিল।৫৬ প্রসঙ্গত কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) উল্লেখ্য।৫৭পুরাতন কৃষ্ণযাত্রার বাক্ধারা তাঁর রচিত 'স্বপ্ন বিলাস', 'দিব্যে ান্মাদ' প্রভৃতি পালায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষ্ণকমল পদাবলি -কীর্তনের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের যাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বর্ধমান জেলার ধবনী গ্রামবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১- ১৯১১) সাতটি যাত্রাপালা রচনা করেন; গায়করূপেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।৫৮ তাঁর একটি শ্যামাসঙ্গীত ঃ ৫৯

মা, অবিচার তোর আগাগোড়া।
কারে দিয়ে স্কন্ধে ঝুলি কারে দাও মা শালের জোড়া
যারা ফাঁকা কাজে সদাই থাকে তাদের দাও মা টাকার তোড়া
যে জন নয়ন মুদে তোকে ডাকে তারে খাওয়াস খুদের গুঁড়া।।...
আর এই দেশ বেড়ানো ব্যবসা দিয়ে নীলকণ্ঠে করলি জন্ম খোঁড়া।।

বদন অধিকারীর সময় থেকেই যাত্রাগানের ভাষায় এবং সুরে বৈদগ্ধ্য সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে কৃষ্ণকমলের এবং নীলকণ্ঠের য াত্রাকে 'বৈঠকী' যাত্রা বললে বোধ হয় ভুল হয় না। কিন্তু মতিলাল রায়(১৮৪৩-১৯০৮) কিছুটা ভিন্ন স্বাদের যাত্রা রচনা করেন রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে।৬০ নীলকণ্ঠ পর্যন্ত যাত্রায় যে পুরাতন রীতি ছিল তা তিনি ত্যাগ করে যাত্রাকে পুরোপুরি নাটকের মতো রূপ দেন। কিন্তু দাঁতভাঙ্গা বাংলায় যে উপক্রমনিকা বা বক্তৃতা তিনি যাত্রাপ ালায় এনেছিলেন, নতুন হ'লেও তা ছিল দুর্বোধ্য।

যাত্রাগানকে অনেকেই পছন্দ করতেন না। হুতোম প্যাঁচা লিখেছিলেনঃ ৬১

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবরি চুল উল্‌কী ও কানে মাকড়ি। অধিকারী দুতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তারপরে বাসদেব ও মণি গোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দুতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত 'কাল জল খাবোনা'! 'কালো মেঘ দেখবো না!! (সামিয়ানা খাট াইয়ে দিমু) 'কাল কাপড় পরবো না' ইত্যাদি কথা বার্ত্তায়..... লোকের মনোরঞ্জন করলেন।

এক বিশেষ ধরনের বাংলা গান 'ঢপ কীর্তন ' নামে সুপ্রচলিত ছিল।৬৬ 'ঢপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শুদ্ধ-সৌষ্ঠব স ম্পন্ন'। ঢপ-কীর্তনের খ্যাতনামা শিল্পিগণ ছিলেন রূপচাঁদ অধিকারী (১৭২২-১৭৯২), অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম ব াউল, রাধারমণ বাউল এবং মধুসূদন কিন্নর অথবা মধুকান (১৮১৮-১৮৬৭)। মধুকান ঢাকা সহরে গিয়ে ওস্তাদ ছোটে খ ান্ ও বড়ে খান্ -এর কাছে মার্গসঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন। যাত্রাগানেও ঢপ-কীর্তনের প্রভাব পড়ে। গোয়াবাগানের পান্ন ামযী এ গানের বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। অপর দুই গায়িকা ছিলেন বামী কীর্তনী ও জগম্মোহিনী কান (কিন্নর)। ১৯৭৪ খ্রিস্ট াব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে সুকীয়া(স) ষ্ট্রিট্ অঞ্চলে ছেলেবেলায় তিনি মহিলা কীর্তন গায়িকার ঢপ-কীর্তন শুনেছিলেন। এ গানের যে বৈশিষ্ট্য তাঁর ১৯৭৪-এও মনে ছিল, তা হল কবি গানের আদলে বিশেষ বিশেষ শব্দকে অনেকবার বিভিন্নভাবে অভিনয়সহ বলা। তাঁদের কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট ছিল।

জয়নারায়ন ঘোষাল -কথিত 'বাঙ্গালার নবগান নুতন ঝুমুর'-এর প্রকৃতি নির্ণয় সহজ নয়। দামোদর মিশ্র তাঁর 'সঙ্গীত দ ামোদর' গ্রন্থে 'শৃঙ্গারবহুলা মাধবীক মধুরা ঝুমুরী' গানের উল্লেখ করেছেন।৬৩ এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, ঝুমুর গানের একটি ক্লাসিক্যাল আদর্শ ছিল। ঝাড়খন্ড অঞ্চলে প্রচলিত ঝুমুর ছিল প্রেমবিষয়ক লোকগীতি; তার একাধিক শৈলী ছিল।৬৪ অথচ ঝুমুর বৈষ্ণব পালাকীর্তনের অংশরূপে এবং একক প্রেমগীতিরূপে গাওয়া হয়েছে। প্রথমে ঝুমুর ছিল এক ধরনের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান। পরে ঝাড়খন্ডের লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে তা হয় 'শৃঙ্গার বহুলা মাধবীক মধুরা' লোক ায়ত প্রেমের গান । কখন কখন যাত্রার অনুষ্ঠানেও ঝুমুর গাওয়া হত। মেদিনীপুরে ভবরাণী বা ভবানী নামক গায়িকা ঝুমুর গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আনুমানিক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।৬৫ ভবপ্রীতানন্দ ওঝা (মানভূম) বহু ঝুমুর গান রচনা করেন। এ সব গানের ভাষা সুসভ্য।

পুরাতন বাংলা গানের একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল পাঁচালী- গান। ৬৬ পাঁচালীর ইতিহাস সুদীর্ঘ। প্রাচীন পাঁচালীর নতুন বিন্যাস করেছিলেনলক্ষ্মীকান্ত ঝিাস (কবিয়াল), গঙ্গা নারায়ন নস্কর (তস্করের ঘরে নস্করের বাস-গঙ্গানারায়ন নস্কর সম্বন্ধে পক্ষীর দলের এই বিদ্রুপ উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত), ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১-১৮৭৬) দাশরথি রায় ৯১৮০৬- ১৮৫৭), রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৯২), ব্রজমোহন রায় (১৮৩১- ১৮৭৬) এবং আনন্দ শিরোমণি (১৮০৩- ১৮৮৭)। এঁরা নতুন নতুন পাঁচালীর পালা (episode) লিখেছিলেন; তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বৈষ্ণবীয় পালা। দাশরথি রায় (দ াশু রায়) কখন কখন সামাজিক পালা গেয়েছেন। পাঁচালীর বিশেষ বিশেষ গান টপ্পার ধরনে গাওয়া হত। বৈষ্ণবী পাঁচ ালী পদাবলি কীর্তনের প্রভাবমুক্ত ছিল না।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী জনপ্রিয় ছিল।৬৭ তিনি বর্ধমানে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও অক্ষয়া বাইতি বা আকা বাই ন ামক মহিলার দ্বারা পরিচালিত কবিগানের দলে ছিলেন। আকা বাইয়ের সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ' দাশরথির সম্পর্ক অশ্লীল খেউড় গ ানের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে নিজস্ব পাঁচালীর দল গঠন করেন। অশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ভ াষায় তিনি প্রধানত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাঁচালী রচনা করেছিলেন। উপমা, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ এবং অনুপ্রাস দাশরথির ভাষ াকে, এবং নিখুঁত সুরে তালে গাওয়া গানকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। প্রয়োজনে অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করলেও

দাশরথির সামাজিক রক্ষণশীলতা সুস্পষ্ট। লক্ষণীয়, ধীরাজ, রূপচাঁদ পক্ষী, দাশরথি রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় গীতশিল্পিগণ অ াধুনিক দিকে ও সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের পরিচিত পৃথিবী দ্রুত গতিতে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল; এটা তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি । সমকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃতির যে সব মাত্রা দৃশ্যমান ছিল না, দাশরথি তাদের খোঁজ র াখতেন। তাঁর সমালোচনাত্মক উপমা যে কি মারাত্মক

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা,
সে কেমন?
যেমন, ঢেঁকিশালে কুকুর কর্ত্তা, বনের কর্ত্তা পশু।
শ্মশানেতে ভুত কর্ত্তা, চোরের কর্ত্তা বাসু।।
গোরস্থানে মামদো কর্ত্তা, ভাগাড়ের কর্ত্তা দানা ।
ছাতনী তলায় পেত্নী কর্ত্তা, শেওড়াতলায় গোনা।।
মাঠে মাঠে রাখাল কর্ত্তা, আঁতুড়ে কর্ত্তা দাই ।
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্ত্তা, এ কর্ত্তা তাই।।

বিভিন্ন পাঁচালির সঙ্গে গেয় অনেক ভাল গানও তিনি রচনা করেন। তাঁর পাঁচালীকে বাংলা প্রবাদের খনি বলা যায়।

ক্রমশ এই সব বাংলা গান ও কবিতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তার অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, 'ভদ্রলোক'-জাতীয় পৃষ্ঠপোষকদের চি ও মূল্যবোধ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। এসব গানের বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিক ভ াবের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান শ্লীল, অভব্য ভাষার মিল ছিল না। বাঙ্গালি 'ভদ্রলোক'পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্য ধরনের কান্তিবিদ্য ার, অন্যধরনের অনুপ্রেরণার সন্ধান পেয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতায় এক ' রোমান্টিক ব্যাকুলতা' ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৬৯ তার আরও একটি লক্ষণ ছিল 'অন্তর্মুখীন গীতিপ্রাণতা'। থিয়েটার যাত্রাগানের, পাঁচালী গানের ও তর্জা গানের জনপ্রিয়তা নষ্ট করল। বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত কোন কোন মফঃস্বল সহরেও ব্যাপক পৃষ্টপোষকতায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। ঢাকা সহর, বর্ধমান সহর, নাটোর, ময়মনসিংহের বিভিন্ন জমিদারশাসিত অঞ্চল মার্গসঙ্গীতচর্চার কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়।

বাংলা গানে 'মোটিফ্' সর্বদা গুত্বপূর্ণ ছিল। এক সময়ে এই 'মোটিফ্' ছিল ধর্ম। তারপরে কতগুলো গানের 'মোটিফ' হয়ে উঠল রসশাস্ত্রসম্মত নায়ক-নায়িকার প্রেম। উনিশ শতকের শেষার্ধে 'মোটিফ্' হল জাতীয়তাবাদ, ব্যাক্তি- চরিত্রের নৈতিক ঊর্ধবায়ন, সমাজ সংস্কার। বিশেষ ভাবে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেসংখ্যাতীত গান লেখা হয়েছিল। এ বিষয়ে গান লিখেছিলেন বহু লেখক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭- ১৯১৯), আনন্দ চন্দ্র মিত্র (১৮৫৪- ১৯১০), এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬- ১৯২৩)। বহু প্রহসনে সংস্কারবিষয়ক বাংলা গান স্থান পেয়েছে। মার্গসঙ্গীতের সুরে তালে গেয় এসব গান এক শক্তিশালীপ্রচার-মাধ্যম হয়ে ওঠে । বিশেষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল র ায় রচিত গান খুব জনপ্রিয় ছিল।

সমাজ - সংস্কার বিষয়ক গানে এবং রাজনৈতিক গানে নিম্নলিখিত 'মোটিফ' প্রাধান্য পেয়েছে,৬৮ যথাঃ

১. বাল্য-বিবাহের ও বহু বিবাহের সমালোচনা। ২. কৌলীন্য- প্রথার অন্তর্নিহিত বর্বরতা। ৩. দাম্ভিক ও দূশ্চরিত্র পুষদের দ্ব ারা নারী-নির্যাতন। ৪. শিক্ষিতা মহিলাদের দৌশ্চারিত্র্য। ৫. পর্দাপ্রথার অপকারিতা। ৬. বালবিধবার দুঃখযন্ত্রণা। ৭. ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে বিরোধের ফলে অশান্তি এবং অনিশ্চয়তা। ৮. মাতলামো। ৯. থিয়েটারের নেতিবাচক পরিনতি। ১০. গণিকাদের দ্বারা কৃত সর্বনাশ। ১১. সামাজিক সংস্কারে তণদের ভূমিকা । ১২. পণপ্রথার বিষময় ফল। ১৩. উচচ শিক্ষিত যুবকদের অদ্ভুত আচরণ। ১৪. বিলাত ফেরৎ ভদ্রলোকের বিস্ময়কর আচরণ। ১৫. দেশাত্মবোধ। ১৬.

খ্যাতনামা দেশ নেতাদের প্রশংসা। ১৭. ভোটরঙ্গ। ১৮. ব্রিটিশ-শোষণের সমালোচনা। ১৯. রাণী ভিক্টোরিয়ার স্তব গান।

প্যারী মোহন সেনগুপ্ত(বঙ্গাব্দ ১২৪১- ১২৮১) - রচিত কতগুলো গানের বিষয়বস্তু ছিল 'মাসকলাই ডাল', 'মাছ', 'পাঁটার মাংস', 'বেগুন' এবং 'আলু'। এ সব গানের সুর ছিল যথাক্রমে মুলতান-একতালা, ভৈরবী - একতালা, কবির সুর- আড়া খেম্‌টা, জংলা -একতালা, এবং ঝিঝিট তেলেনা।৬৮ক

আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে ক্রমশ রাজনৈতিক চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়। তাই সামাজিক 'মোটিফ', -সহ গান যথেষ্ট গুত্বপূর্ণ ছিল। এমন বহু গান লেখা হয়, যাতে লেখকের নিজস্ব অনুভবের তীব্রতা ভাষায় এবং সুরে অভিব্যক্ত হয়। বিক্রমপুরের 'মহাকুলীন' রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ছিলেন। কৌলীন্য বিরোধী তাঁর একটি গান এইরূপ, যথাঃ ৬৯

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি না কোশ্বশুরবাড়ী।
কোন পথে যাইব, মা গো, ঝিনাথ বারড়ীর বাড়ী।।
যারা ছিল ছেলেপিলে, তা'দের হ'ল ছেলেপিলে,
বিয়ে করেই গেলুম ফেলে, ব'য়ে গেল বছর কুড়ী।।
বাড়ী ঘর তো নাহি চিনি,
কেবলশ্বশুরেরই নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা,
তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা,
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেরিয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে,
আর তো হাসি রাখতে নারি,
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী।

এই গানে হাসির সঙ্গে অশ্রু মিশ্রিত। এক সাংঘাতিক ট্রাজেডির দ্যোতনা বহন করে এই গান।

পুষের স্ত্রৈণতা বিষয়ক একটি গানের ভাষা বড় চমৎকার, যথাঃ ৭০

মা! তোমার কুমতি, এমন কেমন রীতি,
তুমি না কি বৌ - কে সমিহ করনা?
এ নবীন বয়সে দু'বেলা রাঁধে সে,
তুমি বেটী একটু নড়েও বসো না!
যে অঙ্গ দেখিলে অনঙ্গ শিহরে
তারে তুমি পাঠাও বারি আনিবারে!
পূর্ণ কুম্ভ যখন সে গো কক্ষে ধরে,
শ্রীঅঙ্গে কত পায় গো বেদনা।।

সামাজিক গান সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা না হলেও 'ভারত সঙ্গীত' বা 'স্বদেশী সঙ্গীত' সম্বন্ধে কিছু গবেষণা হয়েছে।৭১ এখানে বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী, আমাদের সময়সীমার মধ্যে, কে নও গীতকার করেননি। 'ভারত সঙ্গীত' এর তিনটি ধারা ছিল। একটি 'আর্য্য-সভ্যতার গৌরব গাথাঃ দ্বিতীয়টি 'ভারত ম াতার' দুর্দশার জন্য দুঃখের অভিব্যক্তিপূর্ণ গান; তৃতীয়টি 'মা' ভিক্টোরিয়ার বন্দনা, এবং তাঁর কাছে ব্রিটিশ শাসনের সম ালোচনাপূর্ণ আবেদন -নিবেদন। লক্ষনীয়, এ সব গানে ভারতে মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসন সম্বন্ধে একটিও কথা নেই। 'ভ ারত - সঙ্গীত' আসলে ছিল 'হিন্দু- সঙ্গীত'। শুধু মনোমোহন বসু রচিত একটি সুদীর্ঘ গানে এটা উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসলমান শাসকগণ ভারতের সর্বস্ব শোষণ করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না ঃ

তার পরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য
সত্য বটে করত যবন।
কিন্তু মা এমন ক'রে, অন্নের তরে,
কাঁদতো না লোক এখন যেমন।।
সে দায়ে ঠেক্‌তো তারা, ধনী যারা,
আমীর ওমরা জমীদারগণ।
যারা মা সাধারণ লোক, পেতো না শোক,
সুখে কাট্‌তো তাদের জীবন।

'বাউল সুর' ছিল এই বিখ্যাত গানের। এই ধরনের গানে 'মোটিফ্' সুর - তালের চেয়ে বেশি গুত্বপূর্ণ ছিল।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই পর্যালোচনাতেও এটা সুস্পষ্ট যে, পুরানো বাংলা গানে এমন সব উপাদান ছিল, যা প্রাগাধুনিক কাল থেকে আধুনিক কালে বঙ্গ সংস্কৃতির রূপান্তরের কার্যকারণ ও স্বরূপ বোঝার জন্য সাবধানে অধীতব্য । বহু রকমের বাংলা গানে সময়ের ও সংস্কৃতির, মানসিকতার ও বিষয়ের পদক্ষেপ, প্রগতি দেখা যায়। অথচ বাণীর বিন্যাসে, সুরে, তালে পুর াতনও সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় না। নাগরিক গানেও নগরকে ঘিরে থাকা গ্রামের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

ক্রমশ নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা গ্রাম থেকে বহু দুরে চলে আসেন। ফলত বহু পুরান গান অপ্রচলিত হয়ে যায়। অংশত 'পাশ্চাত্য ায়িত' শিক্ষিত বাঙ্গালির সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের ও লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু 'বঙ্গীয় জাতীয়বাদ'-এর প্রেরণায় শু হয় বঙ্গসাহিত্য, বাংলা গান, বঙ্গের ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে সুগভীর গবেষণা। তাতে পুরাতন বাংলা গান যেন মরেও মরল না।

।। প্রমাণ সূত্র ।।

১. Suniti Kumar Chatterji, 'The Eighteenth Century in India,' in Muhammad Shahidullah Felicitaion Volume, Ed. Muhammad Eumul Haq (Dacca, 1966), P. 135

২. কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম', ৩য় খন্ড(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৯১৬), পৃ. ২০০- ৩১২
৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিজীবনী', ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত (কলিকাতা,১৯৫৮), পৃ. ৩৪৯ - ৫০
৪. পুরাতন বাংলা গানের বহু সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪); নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্ত াবলী', ২ খন্ড (কলিকাতা, ১৮৮৮); গুদাস চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদকের মূল্যবান ভূমিকাসহ, 'মনোমোহন গীতাবলী' (কলিকাত, ১৮৮৭); কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩০১); উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

‘সঙ্গীতকোষ’ ()‘শ্রীযুত্ত চন্দ্রকিশোর রায়, গুণসাগর কর্ত্তৃক বর্ণিত’()(কলকাতা, ১৮৯৬); অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ‘প্রীতিগীতি’ (কলিকাতা, ১৮৯৮); অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গীতি-লহরী, অর্থাৎ কালিদাস মুখোপাধ্যায় (শুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায়) (“মির্জা”) মহাশয়ের গীতাবলী সংগ্রহ’, (কলিকাতা, ১৯০৪); হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ‘সঙ্গীতসার সংগ্রহ’ ২ খন্ড (কলিকাতা, ১৮৯৯); নরেন্দ্রনাথ দত্ত(পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ), বৈষ্ণবচরণ বসাক, ‘ঝিসঙ্গীত’ (কলিকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, তারিখ নেই); হরিশচন্দ্র দত্ত, ‘সঙ্গীত তানসেন’ (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৯৯), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ‘রসগ্রন্থাবলী, (কলিকাতা, তারিখ নেই); জগদ্বন্ধু ভদ্র, ‘মহাজন পদাবলী সংগ্রহ’, প্রথম খন্ড (কলিকাতা, ১৮৭২); শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পদরত্নাবলী’ (কলিকাতা, ১৮৮৫), দুর্গাদাস লাহিড়ী, ‘বাঙালীর গান’ (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩১২); অমৃতলাল বসু, ‘বীণার ঝঙ্কার’ (কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩২০)। কাশীপ্রসাদ ঘোষের টপ্পা গানের সঙ্কলন, ‘গীতাবলী’। গ্রন্থটি দেখতে পাইনি। তবে তাঁর বহু টপ্পা উপরে উত্ত ‘প্রীতি গীতি’তে সঙ্কলিত হয়েছে। গোপাল উড়ের টপ্পা’ (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩১৭); রূপচাঁদ পক্ষী, ‘সঙ্গীত রসকল্লোল’, পুনর্বার প্রকাশিত হয়েছে; দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র’, চতুর্থ খন্ড (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃ. ৮৪৬ - ৯৬৪; দ্রষ্টব্য, মহিমচন্দ্র ঝিাস- সম্পাদিত মধুসূদন কিন্নর রচিত‘অক্রুর সংবাদ’, ‘কলঙ্কভঞ্জন’, ‘মাথুর’ ‘প্রভাস’(২য় সংস্করণ, ১৯০৭ঃ দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’- ৪, (কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ৩৪৬ -৪৭, পাদটীকা - ১০১- ১০২; ‘কৃষ্ণকমল (গোস্বামী)- গীতিকাব্য’ নিত্যগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত (বঙ্গাব্দ ১৩১৭); দ্রষ্ট্রব্য ঃ Nisikanta Chattopadhyay, The Yatryas or The Popular Dramas of Bengal (1st. ed. London, 1882). 2nd.ed. with the introduction of Ramakanta Chakraborty (Calcutta 1976)

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সম্পাদিত, ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’ (কলিকাতা, ৩য় সং, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ১৬৯ -৭০; ১৯২- ২২১।

৬. দ্রষ্টব্য, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘গোপাল উড়ের টপ্পা’, পূর্বে উত্ত; এই টপ্পার অশ্লীল সংস্করণ ছিল ।

৭. W. Ward, Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindus 4 volumes (Serampur, 1811), Vol III, IV; W. Hamilton, Description of Hindustan (Delhi ed. 1971), Vol I, P. 104. Ward দুটো টপ্পা গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ঃ Vol. IV, P. 250.

৮. অণ নাগ সম্পাদিত, ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’ (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৯৮) পৃ. ৭৫- ৭৬

৯. G.A. Grierson, The Modern Vernacular Literature of Hindustan (1889), P. XXIII

১০. William Jones, N. Augustus Willard, Musi of India (Calcutta, 2nd. revised edition, 1962), P. 68

১১. কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর, ‘সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম’, তৃতীয় খন্ড (কলিকাতা, ১৮৪৬ঃ গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য), পৃ. ৬৭-৮০ ঃ ‘টপ্পাদি রঙ্গীন গান’। এখানে বহুল পাঞ্জাবী টপ্পা গানের বিষয় বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম, এবং একটি গানের বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু নিজাম-উদ্‌দীন আওলীয়া।১২. ‘বিস্মৃত দর্পণ’-এ সঙ্কলিত ‘গীতরত্ন’ ঃ “রাগরাগিনী সূচী”, দ্রষ্টব্য, রাজ্যের মিত্র, ‘নিধুবাবুর গান’ (কলিকাতা, ১৯৮১)। এখানে নিধুবাবুর ২০টি গানের স্বরলিপি আছে। ‘তবে প্রেমে কি সুখ হ’ত (পিলু খাম্বাজ। তেতলা) গানটির স্বরলিপি এখানে রচিত হয়েছে; কিন্তু গানটি ‘গীতরত্ন’ গ্রন্থে নেই।

১৪. ‘বিস্মৃত দর্পণ’, পৃ. ৯৬ ঃ ৩৬৯- সংখ্যক গীত।

১৫. Sushil kumar De, Bengali Literature in the Nineteenth Century (Calcutta, 1962), P. 361.

১৬. ‘বিস্মৃত দর্পণ’, ‘গীতরত্ন- অংশ, নিধুবাবু- রচিত ভূমিকা।

১৭. রাজ্যের মিত্র, ‘বাংলার গীতকার’, পৃ. ১৫-১৬, ১২০- ১২৬; ‘নিধুবাবুর গান’, পূর্বে উত্ত ।

১৮. ‘সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম’ (১৮৪৬), পূর্বোত্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ২০৯ - ২৩৬। কালী মির্জার গানের এটি আদি সঙ্কলন।

১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্য, ‘বিস্মৃত দর্পণ’, পৃ. ৭৪-৮৯; ‘বাঙ্গালীর গান’, পৃ. ২৮৪, ২৮৫।

২০. ‘বিস্মৃত দর্পণ, পৃ. ৩৮- ৫১; দ্রষ্টব্য ঃ Ramamanta Chakraborty, ‘Songs of Nineteenth Century

Bengali', in O. P. Joshi, ed. Sociology of Oriental Music: A Reader (Jaipur, 1992) pp. 159- 227.
২১. 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', পূর্বে উক্ত, পৃ. ২৮৮.
২২. 'বিস্মৃত দর্পণ', পৃ. ১৩৭ -৩৮, সংখ্যা - ৫৩৫
২৩. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯৬২) পৃ. ৭১৮, ৭২৩; দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৭৯.
২৪. 'ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী' - ১, শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, হরবন্ধু মুখটি সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৯১
২৫. 'বিস্মৃত দর্পণ', পৃ. ৩৮ - ৫১.
২৬ 'মনোমোহন গীতাবলী', পূর্বে উক্ত, 'প্রকাশকের বিজ্ঞাপণ' দ্রষ্টব্য।
২৭. 'ঝিসঙ্গীত', পূর্বে উক্ত, পৃ. ৪৩৯ -৪০
২৮. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' (কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮১), পৃ. ৫৯
২৯. 'বিস্মৃত দর্পণ, পৃ. ৩১ - ৩৭

৩০. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'-৪, পূর্বে উক্ত, পৃ. ৮৪৬ -৯৬৪
৩১. 'সঙ্গীতকোষ', পূর্বে উক্ত, পৃ. ১২০১ - ১২০৯, ১২২৯- ১২৩৬
৩২. Abhayapada Mallik, History of Visnupur Raj (Visnupur, 1921), pp. 110 - 114.
৩৩. দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিত', (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ. ৪২ - ৪৩; কার্ত্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন ঃ রাজবাড়ির গায়মাধব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট 'ভৈরবী রাগিনীর সারে গম একটি, ভৈরব রাগের খেয়াল একটি, আর আলাইয়া রাগিণীর খেয়াল তিনটি শিখিলাম ..... পরে পুনরায় মহেশচন্দ্র খাজাঞ্চি মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি খেয়াল ও টপ্পা শিখি।'
৩৪. শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম, 'ঢাকায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, 'আবহমান বাংলা' (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ৩০৫ - ৩২২ ঃ রচনাটির দুই একটি তথ্য অনুসন্ধানের অভাবে ভুল। দ্র. অজয় সিংহ 'পূর্ব বাংলার উচচাঙ্গ সঙ্গীত', প্রতিক্ষণ ঃ সংস্কৃতি সংখ্যা', ১৯৮৮, পৃ. ৮৭ - ১০১
৩৫. প্রমাণ সূত্র—১ দ্রষ্টব্য; ভূবনমোহন মুখোপাধ্যায়, 'সমাজ
কুচিত্র'; ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ. ১৬৬ - ১৬৭।
৩৬. 'সমাজ কুচিত্র', পৃ. ১৬৩
৩৬ক. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', সম্পাদনা অণ নাগ (কলিকাতা ১৩৯৮) ঃ পৃ. ৩৭ ঃ ' সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি হাতে নিয়ে বসেচেন।' 'সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী, (প্রথম ভাগ), প্রকাশক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, তারিখ নেই)', 'আলালের ঘরের দুলাল', পৃ. ১৫৩ ঃ ' রবিবারে কুঠিয়ালরা ... কেহ বা তবলায় চাবি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন.....'
৩৭. দ্র. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়' (কলিকাতা, ১১৭১); খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কীর্ত্তন' (কলিকাতা, ১৯৪৪); Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnava Kirtan in Bengal', in Journal of Vaisnava Studies, ed. Steven J. Rosen. (Brooklyn, New Youk) Vol. 4 No. 2. Spring 1996 pp. 179 - 199.
৩৮. জয়নারায়ণ ঘোষাল 'কণানিধান বিলাস' (আখ্যাপত্র নেই), পৃ. ২৪৭।
৩৯. দ্র. অমরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদিত 'শাক্ত পদাবলী' (কলিকাতা, ১৯৬১) ।
৪০. 'বাঙ্গালীর গান', পূর্বোক্ত, 'রাজা- মহারাজের গান', পৃ. ৪৫৪ - ৪৯১ ।
৪১. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১ ।
৪২. 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম'- ৩ (১৮৪৫), পৃ. ১৭৭ ঃ 'সহর কলিকাতার গরানহাটা নিবাসী বৈকুণ্ঠবাসি গুণরাশি বাবু কমলাকান্ত দাস সরকারের পুত্র শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস সরকারের বিরচিতা গিতাবলী গ্রন্থ আরম্ভ " । গীতাবলী সংগ্রহ ঃ পৃ. ১৭৭ - ১৯২।
কমলাকান্ত দাস সরকার নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তিনি শাক্ত গীতিও লিখেছেন।

৪৩. 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম'- ৩, উপরে উল্লিখিত, পৃ. ১৫২
৪৪. দ্রষ্টব্য, হরিশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, 'সঙ্গীত তানসেন', পূর্বোক্ত। বিলায়েত হোসেনের গান এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।
৪৫. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গীতসূত্রসার', (৩য় সং, ১৯৩৪), ১ম খন্ড পৃ. ৮২
৪৬. 'ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী', ১ম খন্ড, পূর্বে উক্ত, পৃ. ১১০।
৪৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ২খন্ড (নুতন দিল্লী, ১৯৯৪) ঃ 'চিতেন', ১, পৃ. ৮৭৯; 'খাদ', তদেব-২, পৃ. ১৪২৯;
৪৮. 'ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী'-১, পূর্বে উক্ত, পৃ. ১৬৭।
৪৯. 'সঙ্গীতকোষ', পৃ. ১০৭৭ - ১০৭৮ ।
৫০. দীনেশচন্দ্র সিংহ 'পরিশিষ্ট - ক' তে ঢাকা, ময়মনসিংহ , ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, খুলনা, যশোহর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামের ২৯৩জন কবিয়ালদের নামধাম উল্লেখ করেছেন।
৫১. 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ', পৃ. ৭৮৪ - ৯০২ ঃ কোন কোন গানে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর প্রভাব দেখা যায়।
৫২. তদেব, পৃ.'জ'।
৫৩. W. Ward, Account পূর্বে উক্ত, Vol. 2, Section XVIII, pp. - 496.
৫৪. তদেব, pp. 492 - 495
৫৫. The Calcutta Review, XV pp. 349 - 50
৫৬. 'বাঙ্গালীর গান,' পৃ. ৩২৫।
৫৭. দ্র. নিত্যগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, 'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য', পূর্বে উক্ত। কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে আলোচনা ঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত— ৪' (কলিকাতা ১৯৭৩), পৃ. ৫০২ - ৫২০
৫৮. দ্র. গোপেশচন্দ্র দত্ত, 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়', (কলিকাতা, ১৯৭৬)
৫৯. তদেব, পৃ. ৩২৭।
৬০. দ্র. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়' (১৩৭৪) ।
৬১. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১; যাত্রা যাতে এক ঘেয়ে না হয়ে যায়, এ জন্য 'মধ্যে মধ্যে 'বাবা দে আমায় বিয়ে' ও আমার নাম সুন্দরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকম ওয়ারিও সং-এরও অভাব ছিল না।'
৬২. আলোচনা দ্রষ্টব্য; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭ -৩৩৯।
৬৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৪৩; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'গৌরবঙ্গ-সংস্কৃতি' (কলিকাতা, ১৯৭২), পৃ. ১১৬ -১১৭; বিষয়টি সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ ঃ মূর্ণিমা সিংহঃ 'বরাহভূমের লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের বিবর্তনের সূত্র', 'সাহিত্য পত্র ', আষাঢ়, ১৩৭৭, দ্রষ্টব্য। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, গৌরাঙ্গী, রামচরণ ও ভরত—সকলেই ছিলেন মানভূমের কবি ও ঝুমুর গান রচয়িতা। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ঝুমুরগানের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। একটি বিখ্যাত ঝুমুর গানঃ

'ঝিঙা ফুলে লিলেক জাতি কুল গো/ পিরীতি হইল শূল'—ইত্যাদি। হিন্দী ভাষাতেও বহু ঝুমুর গান রচিত হয়। দ্র. চিত্তরঞ্জন দেব, 'বাংলার পল্লীগীতি' (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃ. ৬৯ - ৮৪; দ্রষ্টব্য, সুব্রত মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'রসিক' (কলিকাতা, ১৯৯১) ।
৬৪. পূর্ণিমা সিংহ, (উপরে উল্লিখিত) বিভিন্ন শৈলীর উল্লেখ করেছেন।
৬৫. 'বাঙ্গালীর গান', পৃ. ১০৪৩।
৬৬. দ্রষ্টব্য ঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা, ১৯৬৪) ।
৬৭. হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' (কলিকাতা, ১৯৬২) ।
৬৮. তদেব, পৃ. ৬৬৫।
৬৯. অণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭)। পরিশিষ্টে 'কাব্য তা

লিকা' (১৮৫৮ - ১৯১০) দ্রষ্টব্য।
৭০. Ramakanta Chakrabarty, 'Songs of Nineteenth Century Bengali',

পূর্বোক্ত; দ্রষ্টব্য, 'সঙ্গীতকোষ ', পৃ. ১০২৫, ১০২৬, ১০২৯, ১০৩৭, ১০৩৯ ।
৭১. 'সঙ্গীতকোষ', পৃ. ১০২৯।
৭২. 'সঙ্গীতকোষ', পৃ. ১০৪৮।
৭৩. 'বাঙ্গালীর গান,' পৃ. ৫৩৪ -৫৩৮ ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com